১৭

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার

আনু জালে

অধ্যায়টি উর্দুভাষী মুসলমানদের নিয়ে, যারা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে।[১] এখানে এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ইতিহাসের আলোকে এদের নাগরিকত্ব, ভোট প্রদানের অধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত ২০০৮ সালে সংঘটিত ঘটনা ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রান্তিকীকরণ ও বর্জন[২]

বাংলাদেশে প্রায় তিন লাখ উর্দুভাষী রয়েছে, যাদের অর্ধেকই বাস করে সারাদেশে ১১৬টি ক্যাম্পে। স্বীকার করা হোক বা না হোক, সম্প্রতি

---

১ ‘উর্দুভাষী’ শব্দটি এই জনগোষ্ঠীর নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে (প্রকৃতপক্ষে এই প্রজন্ম দ্বিভাষী এবং বাংলাকে এরা প্রধান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে)। ‘আটকে পড়া পাকিস্তানি’ শব্দটি প্রধানত এসপিআরসিজি (স্টার্ন্ডেড পাকিস্তানি জেনারেল রিপেট্রিয়েশন কমিটি) নামক একটি সংস্থা দ্বারা ব্যবহৃত হয় যারা শক্তভাবে কিন্তু নিষ্ফলতার সাথে উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীকে পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের জন্য আবেদন জানায় এবং যারা কখনোই বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ উর্দুভাষী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেনি। ‘বিহারি’ শব্দটি ইদানীং গণমাধ্যমে যে অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা এই সমাজের ওপর ভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। অনেক উর্দুভাষী প্রকৃতপক্ষে ভারতের উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও এসেছে।

২ আহমেদ ইলিয়াস, *দি ইন্ডিয়া আমেগ্রেস ইন বাংলাদেশ : এন অবজেকটিভ অ্যানালাইসিস* (‘বাংলাদেশি ভারতীয় অভিবাসী’ কর্তৃক ২০০৮ সালে অনূদিত), শামসুল হক ফাউন্ডেশন, সৈয়দপুর, ২০০৩।

নাগরিকত্বের অধিকার পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা সন্তানদের সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে পারত না, ক্যাম্পের বাইরে বাড়ি করতে পারত না এবং সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্যের শিকার হতো।[৩]

এসব উর্দুভাষী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল বিভিন্ন কারণে। কিছুসংখ্যক এসেছিল নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলিম জাতিত্ব বোধ তৈরির নিদর্শনরূপে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অংশ ভারত ভাগের আগে এবং পরে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে প্রধানত কলকাতা ও বিহার হতে পালিয়ে এসেছিল। পাকিস্তান আমলে উর্দু বলতে পারার সুবিধার কারণে তারা সহজে সরকারি চাকরি (বিশেষ করে রেলওয়ে বিভাগ), গৃহায়ন সুবিধা এবং সামাজিক মর্যাদা লাভ করে। প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে তাদের অনেকে ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি অভিজাত শ্রেণী এবং বাঙালিদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে।

ভাষা অন্দোলনের ফলে ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গভীর হতে থাকলে পরিস্থিতি বদলে যায়। উর্দুভাষীরা 'পাকিস্তান রক্ষায়' এগিয়ে আসে, কিছু বাঙালিও তাদের সাথে যোগ দেয়। তবে কিছু উর্দুভাষী বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।[৪]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী উর্দুভাষীকে যুদ্ধাপরাধ এবং পাকিস্তানি শাসকদের সহযোগিতা করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। কিছু লোকের এরূপ অপকর্মের ফলে গোটা সম্প্রদায়ের ওপর প্রত্যাঘাত নেমে আসে, ফলস্বরূপ উর্দুভাষীরা দিনে দিনে তাদের জীবিকা, বাড়িঘর, নিরাপত্তা, মর্যাদা, এমনকি তাদের জীবন হারাতে থাকে। তাদের অনেক নেতা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এ কারণে, তারা সারাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে স্থানান্তরিত হয় এবং এখন পর্যন্ত সেখানেই আছে। ক্যাম্পে বসবাসরত এসব উর্দুভাষী প্রায় চার দশক ধরে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় রয়েছে।

উর্দুভাষীরা ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করে, আট ফুট বাই আট ফুট মাপের একটি ঘরে তাদের সপরিবারে থাকতে হয়। শৌচাগারের জন্য

---

৩ 'সিটিজেনশিপ ফর বিহারি রিফিউজি', *বিবিসি নিউজ*, ১৯ মে ২০০৮।

৪ ১৯৫২ সালের ভাষা আান্দোলনে যুক্ত ছিলেন উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাবুল আহমেদ, মমতাজ খান এবং সৈয়দ মোহাম্মদ। এছাড়া ছিলেন ড. ইউসুফ হাসান এবং আহমদ ইলিয়াস।

সেখানে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলতে আসলে ক্যাম্পবাসীদের কিছু নেই। কেউ কেউ টাকা সঞ্চয় করে ক্যাম্পের বাইরে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক না হওয়ার কারণে তাদের ভোট প্রদান, পাসপোর্ট ধারণ করা অথবা কোনো চাকরি করার অনুমতি দেয়া হয় না। এহেন দুর্দশা লাঘবের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করারও কোনো রাজনৈতিক শক্তি তাদের ছিল না। ফলে তাদের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অন-ানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করতে বাধ্য হয় এবং রিকশাচালক, ড্রাইভার, কসাই, নাপিত, মিস্ত্রি, দর্জি, কারখানা শ্রমিক প্রভৃতি হিসেবে কাজ করে খুব অল্প পরিমাণ আয় করে।

আইনি সাফল্য

২০০৩ সালে উর্দুভাষী সম্প্রদায়ের দশজন যুবক তাদের নাগরিকত্ব এবং ভোটের অধিকার দাবি করে হাইকোর্টে একটি রিট দাখিল করে। হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়ের মধ্য দিয়ে কিছুসংখ্যক উর্দুভাষী প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রায়ে বলা হয় যে, যেসব উর্দুভাষী স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশি ভূখণ্ডে বসবাস করত এবং যারা স্বাধীনতার পর জন্মগ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে ক্যাম্পে বাস করছে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী) আদেশের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে।[৫]

যা হোক, হাইকোর্টের এই আদেশ পালন করার রাজনৈতিক ইচ্ছা খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০০৭ সালের ২৬ নভেম্বর একটি নতুন রিট মামলায় নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চায়– কেন সারাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষীদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য তৈরিকৃত একক ভোটার তালিকায় সংবিধান অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। এরপর মাসব্যাপী উর্দুভাষীদের ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে এবং বিপক্ষে বি-ভিন্ন পত্রপত্রিকায় তীব্র বিতর্ক চলে। নিন্দুকেরা বলে তাদের কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব প্রদান করা উচিত নয়, অন্যদিকে বেশিরভাগেরই মত হলো, উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীকে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা উচিত।[৬] ছোট ছোট পুস্তিকা লিখে এবং সেগুলো বিতরণ করে

৫ 'স্ট্যান্ডেড পাকিস্তানি', *বিবিসি নিউজ*, ৬ মে ২০০৩।

৬ স্পষ্টতই স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরও এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। এই অনুভূতি বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ভেতর কাজ করে যে, তারা কাম্য নয়। তানভীর মোকাম্মেলের প্রামাণ্যচিত্র 'স্বপ্নভূমি'র (

উর্দুভাষী যুবকেরা বাঙালি সমাজের মূলধারার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। এর ফলে কিছু সক্রিয় কর্মী দল তৈরি হয়, যারা বাংলাদেশে উর্দুভাষীদের সমান নাগরিক অধিকার এবং নাগরিকত্বের জন্য প্রচারণা চালায়। শেষমেশ, ২০০৮ সালের ১৮ মে হাইকোর্ট উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীকে (ক্যাম্পবাসী এক লাখ ৫০ হাজারসহ যারা ক্যাম্পের বাইরে বাস করে) বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে ঘোষণা করে।[৭] ফলে নির্বাচন কমিশন নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার হিসেবে সব উর্দুভাষীকে নিবন্ধিত করতে শুরু করে।

হাইকোর্টের রায়ের পরে বিভিন্ন স্তরে উর্দুভাষীরা নাগরিক হিসেবে তাদের নাগরিক অধিকার দাবি করা শুরু করে কিন্তু প্রতিনিয়তই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।[৮] উদাহরণস্বরূপ, মোহাম্মদপুর ক্যাম্পের দু'জন উর্দুভাষী ভোটার পরিচয়পত্র পাওয়ার পর পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে কিন্তু ক্যাম্পে বাস করার কারণে তাদের পাসপোর্টের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে তাদের জন্মনিবন্ধন করতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে আল-ফালাহ্ বাংলাদেশের (একটি বেসরকারি সংগঠন) সহায়তায় এবং প্রচারণায় তাদের জন্মনিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

জটিলতা

হাইকোর্টের মধ্য দিয়ে উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যকার প্রজন্মগত একটা ব্যবধান অনাবৃত হয়েছে। যুবা প্রজন্মকে এই রায়ে অনুপ্রাণিত হতে দেখা গেলেও উর্দুভাষীদের মধ্যে যারা বয়োবৃদ্ধ তারা যুবাদের এই উৎসাহে প্রবল হতাশা প্রকাশ করে। রায়ের পর 'এসপিজিআরসি'র (স্ট্যান্ডেড পাকিস্তানি জেনারেল রেপ্যাট্রিয়েশন কমিটি) নেতৃত্বে অনেকে ভোটার তালিকায় তাদের

দি প্রমিজ ল্যান্ড) একটি দৃশ্যে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার মাধ্যমে তা আলোকপাত করা হয়েছে, যেখানে একজন যুবক প্রশ্ন করেছে– 'আমাদের ভারত চায় না, পাকিস্তান বা বাংলাদেশও চায় না, তাহলে কি আমরা ইথিওপিয়ার নাগরিক?' এই প্রামাণ্যচিত্রটি উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীকে মুছে ফেলার একটি দলিল, যা নতুন প্রজন্মকে সামনে নিয়ে আাসে এবং তাদের আশা- আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে।

৭ পিওয়াইআরইম (উর্দু স্পিকিং পিপল ইয়ুথ রিহেবিলিটিশন মুভমেন্ট)-এর নেতা শাহাদত খান ফাক্কুর কর্তৃক দায়েরকৃত একটি রিট মামলার শুনানি শেষে বিচারপতি এম এ রশিদ এবং বিচারপতি আসফাকুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট দ্বৈতবেঞ্চ রায় ঘোষণা করেন। আবেদনকারী পক্ষে মামলাটির শুনানি করেন রফিকুল ইসলাম মিয়া। দেখুন : এ.টি.এম মোরশেদ আলম, 'জন্ম সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব', *আসক বুলেটিন*, জুন ২০০৮,পৃ. ১০।

৮ আল-ফালাহ সংগঠনের মোহাম্মদ হাসানের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

নাম নিবন্ধনে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের যুক্তি, যদি তারা ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধন করে, তাহলে তারা জেনেভা ক্যাম্পে থাকার অধিকার হারাবে, সরকার তাদের ক্যাম্প থেকে উচ্ছেদ করবে।

যদি তারা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিবন্ধিত হয় তাহলে যে জমির ওপর তাদের ঘর আছে সেই জমির অধিকার কার থাকবে, তাদের আইনি মর্যাদা কী হবে এবং তাদের পুনর্বাসনের কী ব্যবস্থা নেয়া হবে ইত্যাদি বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত উদ্বেগ প্রকাশ করে এসপিজিআরসি। উদ্বেগের আরো বিষয় হলো, ক্যাম্পে আসার পূর্বে তাদের যে সম্পত্তি ছিল সরকার কি তাদের তা ফেরত দেবে নাকি তাদের ক্যাম্পেই বসবাস চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে, নাকি বাংলাদেশি নাগরিকত্ব দেয়ার সুবাদে ক্যাম্পে বসবাসের অধিকার কেড়ে নেয়া হবে। এছাড়া ক্যাম্পের ভেতরে তাদের বাড়ির মালিকানা তাদের থাকবে কিনা, এগুলো বেচাকেনা করার অধিকার সরকার তাদের দেবে কিনা এসব বিষয় নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন। সেই সাথে আরো উদ্বেগের বিষয় হলো, ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকার উর্দুভাষীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং নাগরিক অধিকার প্রদানের এই সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখাবে কিনা?

জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন : ধীর কিন্তু ইতিবাচক

নবম সংসদ নির্বাচনের প্রচার অভিযানে মূলধারার সব রাজনৈতিক দল উর্দুভাষীদের নাগরিকত্ব বিষয়ে হাইকোর্টের রায়কে মেনে নেয়ার সঙ্কেত দেয়। উর্দুভাষী সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নিরলস সংগ্রাম চালিয়েছে উর্দুভাষী যুবা নেতারা। তাদের সাথে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাগুলোও সংহতি প্রকাশ করে আসছে। এক্ষেত্রে 'বাংলা-উর্দু সাহিত্য ফোরাম' তাদের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নিজেদের সংস্কৃতির মেলবন্ধন তৈরি করতে নিজেদের কবিতা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা আয়োজন করে 'বাংলা-উর্দু সাহিত্য ফোরাম'। এতে একে অপরের সংস্কৃতির মূল্যায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।[৯]

অনুবাদ : লুবানা রশিদ

৯ এ সম্পর্কে সৈয়দপুরের মোহাম্মদ আশরাফুলের, বাংলা কবি পরিষদের আহাদ চৌধুরী এবং কামাল লোহানীর লেখা দেখুন।